ইউনিট ৬

তন্তু ও বস্ত্র

ভূমিকা

আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে একটি হল বস্ত্র। বস্ত্র বা কাপড় তৈরির জন্য দরকার সুতার। সুতার উপাদান হলো তন্তু। তন্তু মূলত আঁশ জাতীয় বস্তু। সাধারণ অর্থে যে কোনো আঁশকেই তন্তু বলে। কিন্তু বয়ন শিল্পে যে সব আঁশ দিয়ে বয়ন বা বুননের কাজ সম্ভব কেবল সেগুলোকেই বয়নতন্তু বা সংক্ষেপে তন্তু বলে। তন্তু থেকে সুতা হয়। সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি হয়। এছাড়া, কার্পেট, বিভিন্ন ধরনের বুনন, ফিল্টার, তড়িৎ নিরোধক এবং আরও হাজারো রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি হয়।

তন্তু রাসায়নিকভাবে এক ধরনের পলিমার (Polymer)। হাজার হাজার মনোমার (Monomer) অণু নিয়ে গঠিত হয় এ পলিমার। তন্তুর অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক গঠন এদের দৈর্ঘ্য, স্থায়িত্ব, শোষণ ক্ষমতা, নমনীয়তা ইত্যাদি গুণাবলীকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন গুণের তন্তু ব্যবহৃত হয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কার্পাস সুতা, রেশম, পশম ও লিনেন। এগুলো প্রকৃতি হতে সহজেই আহরণ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মানুষ রাসায়নিক তন্তু পলিথিন, নাইলন, পলিএস্টার ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছে। সুতার চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হয়েছে আরও বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম বা সিন্থেটিক (Synthetic) তন্তু। এর পরেও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গবেষকগণ আরও উন্নতমানের তন্তু ও সুতা তৈরির জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

পাঠ ৬.১

তন্তু ও তন্তুর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তন্তুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার তন্তু সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার তন্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন;
- তন্তুর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

তন্তু ও তার শ্রেণীবিভাগ

বয়ন শিল্পে যে সব আঁশ দিয়ে বয়ন বা বুননের কাজ সম্ভব, সেগুলোকে বয়ন তন্তু বা সংক্ষেপে তন্তু বলে। তন্তু থেকে সুতা এবং সুতা থেকে কাপড়, কার্পেটসহ বহুরকম বস্ত্রজাতীয় দ্রব্যাদি তৈরি হয়। উৎস হিসাবে তন্তুকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- প্রাকৃতিক তন্তু ও কৃত্রিম তন্তু।

প্রাকৃতিক উৎস এবং খনিজ হতে আহরিত তন্তুসমূহকে বলা হয় প্রাকৃতিক তন্তু। গবেষণাগারে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে তন্তু তৈরি করেন সেগুলোকে কৃত্রিম তন্তু বলে।

প্রাকৃতিক তন্তু

প্রাকৃতিক তন্তু হলো তুলা বা কটন, পাট, লিনেন, উল, সিল্ক ও অ্যাসবেসটস। এই জাতীয় তন্তুর মধ্যে কার্পাস তুলা বা কটন সবচাইতে অধিক পরিচিত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতিতে তন্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। উদ্ভিজ তন্তু প্রাণিজ তন্তু এবং খনিজ তন্তু। এই তন্তুসমূহ থেকে বিশ্বের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির অর্ধেকেরও বেশি চাহিদা মেটানো হয়।

উদ্ভিজ তন্তু

উদ্ভিদ বা গাছ থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় তাকে উদ্ভিজ তন্তু বলে। এই জাতীয় তন্তুর মধ্যে কার্পাস তুলা বা কটন সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। কার্পাস নামক গাছের ফল থেকে এ আঁশ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আঁশগুলি থাকে ফলের মধ্যে বীজের চারিদিকে। এই জন্য এই তন্তুর আর এক নাম বীজতন্তু। কার্পাস তুলা ছাড়াও শিমুল গাছের ফলের মধ্যেও একই ভাবে তুলার আঁশ থাকে। এটিও বীজতন্তুর অন্তর্ভুক্ত। এটি শিমুল তুলা বা ক্যাপক নামে পরিচিত।

উদ্ভিদের ছাল বা বাকল থেকে যে তন্তু পাওয়া যায় তাদের নাম বৃক্ষ কোষ তন্তু। এ ধরনের তন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাট। পাট গাছের ছাল থেকে এ তন্তু সংগ্রহ করা হয়। পাটের পরেই উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ কোষ তন্তু হলো লিনেন। তিসি বা মসিনা নামে পরিচিত আমাদের তৈল বীজ উদ্ভিদের সাধারণ নাম ফ্লাক্স। ফ্লাক্স জাতীয় উদ্ভিদের ছাল থেকে উৎপন্ন হয় লিনেন তন্তু। বৃক্ষ কোষ তন্তুর অন্যান্য উদাহরণ হলো শন, র‍্যামি, মেসতা ইত্যাদি। এসব দিয়ে দড়ি, চট, ছালা, বস্তা ইত্যাদি তৈরি হয়।

গাছের পাতা মূল বা ডাঁটা থেকেও তন্তু পাওয়া যায়। যেমন ম্যানিলা, সিসল, আনারস ইত্যাদি। এগুলোকে ভাসকুলার (Vascular) তন্তু বলে। এগুলো সাধারণত গ্লুকোজের পলিমার যাকে আমরা সেলুলোজ (Cellulose) বলে থাকি।

প্রাণিজ তন্তু

এ ধরনের তন্তু পশম বা উল এবং রেশম। পশম জাতীয় তন্তু তৈরি হয় খরগোশ, উট এবং বিভিন্ন ভেড়া জাতীয় পশুর লোম বা চুল থেকে। এগুলো সাধারণত প্রোটিন তন্তু, এমিনো এসিডের পলিমার দিয়ে গঠিত। উলের তন্তুর তল অমসৃণ ফলে এর মধ্যে বাতাস আঁটকে থাকে। তাই উলের তৈরি পোশাক পরলে বেশ গরম অনুভূত হয়। রেশম বা পলু পোকা নামে এক জাতীয় পোকার গুটি থেকে রেশম বা সিল্ক তন্তু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এগুলো

হচ্ছে পলু পোকার মুখ নিসৃত লালা যা আপন শরীরের চারপাশে এরা বুনতে থাকে। প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশমই সবচেয়ে শক্ত।

খনিজ তন্তু

খনিজ গর্ভে কঠিন শিলার স্তরে স্তরে বা ভাঁজে ভাঁজে জমা হয় এক প্রকার আঁশ। এদের বলা হয় অ্যাসবেসটস (Asbestos)। অ্যাসবেসটস শব্দ, উচ্চতাপ ও বিদ্যুৎরোধক। ইনসুলেশন, অগ্নিরোধক ও শব্দরোধক ইত্যাদিতে তন্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে এই তন্তু বা তন্তু হতে প্রস্তুত বস্ত্র স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা সৃষ্টি করে।

কৃত্রিম তন্তু

যে সব তন্তু রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে গবেষণাগারে তৈরি করা হয় সেগুলো হলো কৃত্রিম তন্তু বা সিনথেটিক (Synthetic) তন্তু। বেশিরভাগ কৃত্রিম তন্তু হলো হাইড্রোকার্বনের পলিমার যৌগ। একটি ইউনিট রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরস্পরকে জোড়া লাগালে যে লম্বা শিকল পাওয়া যায় তাই পলিমার। বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন এবং এদের জাতক (derivative) এর পলিমার হতে বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন তন্তু তৈরি হয়। এগুলো আবিষ্কারের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডবলু. এইচ. ক্যারোথার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পলিমারের উপর গবেষণা করার সময় তিনি সর্বপ্রথম নাইলন আবিষ্কার করেন। পরিবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের পলিমার করণের ফলে বস্ত্র বয়নের গুণাগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের তন্তু তৈরি করা হয়। সাধারণত উত্তপ্ত তরল পলিমার ছিদ্রযুক্ত চাক্তির মধ্য দিয়ে মেশিনের সাহায্যে প্রচন্ড চাপে ঠেলে দেয়া হয়। এইভাবে সূক্ষ ছিদ্রপথে আঁশের আকারে বেরিয়ে আসা রাসায়নিক পদার্থ জমাট বেঁধে শক্ত হয় এবং তন্তু বা সুতায় পরিণত হয়।

এই ধরনের সুতা বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন হয়। এদের প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- সেলুলোজিক তন্তু এবং অসেলুলোজিক বা নন-সেলুলোজিক তন্তু।

সেলুলোজিক তন্তু

সেলুলোজ হলো কার্বহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় পদার্থের পলিমার। এটি অতি আঁশ জাতীয় পদার্থ যা দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিভিন্ন অংগ বা কোষ গঠিত হয়। সেলুলোজকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় সেলুলোজিক তন্তু। একে রিজেনারেটেড তন্তুও বলা হয়। ছোট আঁশের তুলা, বাঁশ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি থেকে সেলুলোজ তন্তু উৎপাদন হয়। রেয়ন (Rayon) একটি সেলুলোজিক তন্তু। এটি প্রথম উৎপাদিত কৃত্রিম তন্তু।

সেলুলোজের এসিটেট জাতও এক ধরনের তন্তু। রেয়ন এবং সেলুলোজ এসিটেট বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার হয়। রেয়ন গাড়ির টায়ারের লাইনিং হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।ভিসকাস রেয়ন, কিউপ্রোটাই এসিটেট ইত্যাদি সেলুলোজিক কৃত্রিম তন্তু। প্রাকৃতিক সেলুলোজিক তন্তু হলো তুলা, শিমুল তুলা, পাটের আঁশ ইত্যাদি।

নন-সেলুলোজিক তন্তু

প্রাকৃতিক সেলুলোজ নয় এমন পদার্থ যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পলিমারকরণ দ্বারা রসায়নবিদগণ গবেষণাগারে এমন সব পদার্থ তৈরি করেছেন যেগুলোর মধ্যে তন্তুর গুণাগুণ বিদ্যমান।এগুলো হলো নন-সেলুলোজিক তন্তু।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাইলন, পলিএস্টার, এক্সাইলিক, এরামিড, স্পানডেক্স, পলিপ্রপাইলিন ইত্যাদি। নাইলন প্রথম উদ্ভাবিত সিনথেটিক তন্তু। এটি হালকা ও শক্ত। কার্পেট, দড়ি, টায়ার ইত্যাদি তৈরিতে নাইলন ব্যবহৃত হয়। পলিএস্টার তন্তু দীর্ঘস্থায়ী, মোচড়ালে বা দোমড়ালে দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপড়, শক্ত সিট, বালিশের কভার ইত্যাদি তৈরি হয়। এছাড়া প্লাস্টিক তন্তু ফিল্টার, নৌকার পাল এবং অন্যান্য অনেক ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এক্সাইলিক তন্তু নরম ও দীর্ঘস্থায়ী। এক্সাইলিক সুতা দেখতে উলের মত। তাই এ দিয়ে কৃত্রিম উল বা পশম তৈরি হয়। একাধিক সেলুলোজিক এবং নন-সেলুলোজিক তন্তু মিলিয়ে অধিক ব্যবহার গুণ সম্পন্ন এ ধরনের নিত্য নতুন কৃত্রিম তন্তু উদ্ভাবিত হচ্ছে। এ দু'ধরনের কৃত্রিম তন্তু ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু হলো :

ধাতব তন্তু : যে কোনো নরম ধাতু যেমন সোনা, রূপা, তামা বা এদের সংকর ধাতুকে যান্ত্রিক উপায়ে টেনে অত্যন্ত মিহি তার বা সুতা তৈরি করা হয়। আবার বিভিন্ন ধাতব পদার্থ কখনও প্লাস্টিক দিয়ে অথবা অন্য কোনো

মিশ্রিত ধাতব পদার্থ দিয়ে, কখনও প্লাস্টিক ও ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে আবার কখনও একক কোনো পদার্থ দিয়ে আবৃত করে সুতা বা তন্তু তৈরি করা হয়। এই ধাতব তন্তুসমূহ সাধারণত ডেকোরেটিভ বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন জরি, মাইলার, ড্রুবাস্ট্রোন, রেমেট ইত্যাদি। পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে বিভিন্ন প্রকার তন্তুর শ্রেণীবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত সার নিচের চিত্র : ৬.১-১ এ দেখান হলো:

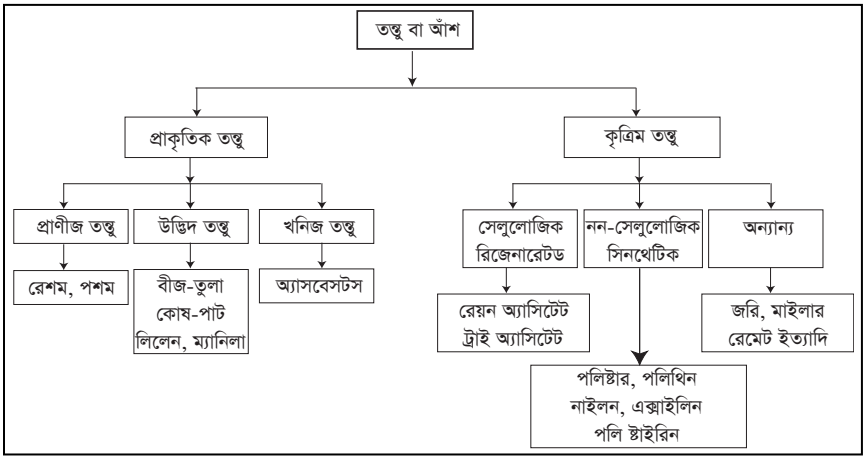

চিত্র ৬.১-১ : তন্তুর শ্রেণিবিন্যাস

সারসংক্ষেপ

- তন্তু বা আঁশ থেকে সুতা তৈরি হয় এবং সুতা থেকে বিভিন্ন ধরনের কাপড় বুনানো হয়।
- উৎস হিসাবে তন্তুকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। প্রাকৃতিক তন্তু, যা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। যেমন- তুলা, পাট, শন ইত্যাদি।
- কৃত্রিম তন্তু যা কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। যেমন : নাইলন, পলিএস্টার, টেট্রন ইত্যাদি।
- আমাদের শরীর আবৃত করার জন্য বস্ত্র হিসাবে তন্তুর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ইহা ছাড়াও নৌকার পাল, তাবু ইত্যাদিতেও তন্তু ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তন্তু কি জাতীয় বস্তু?
ক. তরল বস্তু খ. আঁশ জাতীয় বস্তু গ. কঠিন বস্তু ঘ. ঘন বস্তু

২. কোনটি প্রকৃতি থেকে সহজে আহরণ করা যায়?
ক. পলিথিন খ. লিনেন গ. পলিএস্টার ঘ. কোনোটি নয়।

৩. লিনেন কি?
ক. বীজ খ. বৃক্ষ কোষ গ. প্রাণিজ তন্তু ঘ. খনিজ তন্তু

৪. বেশির ভাগ কৃত্রিম তন্তু কি প্রকৃতির?
ক. উদ্ভিজ খ. প্রাণিজ গ. ধাতব ঘ. প্লাস্টিক

৫. প্রথম উৎপাদিত কৃত্রিম তন্তু কোনটি?
ক. রেয়ন খ. রেশম গ. নাইলন ঘ. পশম

৬. খনিগর্ভে কঠিন শিলাস্তরের মাঝে যে আঁশ জমা হয় তাকে কি বলে?
ক. খনিজ আঁশ খ. সিসল গ. অ্যাসবেসটস ঘ. ফ্লাক্স।

পাঠ ৬.২

পাঠ-২

সুতা তৈরি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তন্তু সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুতা পাকানোর বিভিন্ন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সুতা কাউন্ট এর পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

তন্তু সংগ্রহ

বস্ত্র বয়নের জন্য প্রয়োজন সুতা। তন্তু থেকে সুতা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তন্তুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুতা তৈরি হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সব ধরনের তন্তু থেকে সুতা তৈরির কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন হলো আঁশ বা তন্তু সংগ্রহ।

ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে তন্তু সংগ্রহের পদ্ধতিও বিভিন্ন। যেমন কটন বা তুলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাঠ থেকে কার্পাস ফল সংগ্রহের পর বীজ থেকে তুলা পৃথক করা হয়। বীজ থেকে তুলা পৃথকীকরণের পদ্ধতিকে জিনিং বলে। জিনিং-এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত। জিনিং-এর মাধ্যমে বীজ থেকে তুলা পৃথকীকরণের পর প্রাথমিকভাবে যে তন্তু পাওয়া যায় তার নাম কটন লিন্ট। এটাই সুতা তৈরির মৌলিক উপাদান। বেশ কিছু পরিমাণ কটন লিন্ট নিয়েই গাইট বা বেল বাঁধা হয়। সুতা কাটার জন্য এই বেলগুলো আনা হয় স্পিনিং কারখানায়।

পাট, শন, তিসি ইত্যাদি থেকে আঁশ সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণত পরিণত অবস্থায় এ সব উদ্ভিদ কেটে কয়েকদিনের জন্য সামান্য প্রবাহমান পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে পঁচানো হয়। তারপর আঁশ ছাড়ানো হয়। এই আঁশ পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে রৌদ্রে শুকানো হয়। পরে সাইজ অনুযায়ী এগুলোকে গাঁট বেঁধে সুতা কাটার জন্য স্পিনিং কারখানায় আনা হয়।

উল বা পশমী সুতার জন্য ব্যবহৃত তন্তু হলো প্রাণীর দেহের লোম বা চুল। উলেন সুতা তৈরির জন্য বিভিন্ন পশুর গা থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ লোম কেটে নেয়া হয়। তন্তু সংগ্রহের পর প্রাণী বেঁচে থাকে এবং আবার লোম গজায়। এভাবে একই পশুর শরীর থেকে একাধিকবার পশম সংগ্রহ করা হয়। এই সংগৃহীত পশমকে বলে ফ্রিজ উল। সুতা কাটার জন্য বস্তা ভর্তি ফ্রিজ উল স্পিনিং কারখানায় আনা হয়।

রেশম এবং কৃত্রিম তন্তু থেকে সরাসরি উৎস থেকে সুতা সংগৃহীত বা উৎপাদিত হয়।

সুতা কাটা বা স্পিনিং

বিভিন্ন তন্তু থেকে সুতা কাটার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বিভিন্ন। তাই একই কারখানায় সবধরনের তন্তু থেকে সুতা কাটা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন তন্তুর সুতা তৈরির কারখানাও ভিন্ন। আলাদা কারখানায় আলাদা পদ্ধতিতে সুতা কাটা হলেও পদ্ধতিগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান। এবারে এগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ব্লেন্ডিং এন্ড মিকসিং : কারখানার বেল বা গাঁইট বাঁধা কটন লিন্টকে প্রথমে নেয়া হয় ব্লো রুমে। সেখানে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তুলাকে পেঁজা হয় এবং বিভিন্ন জাতের তুলার মিশ্রণ তৈরি করা হয়। একে বলে ব্লেন্ডিং এন্ড মিক্সিং (Mixing)। কটনের বেলায় যাকে ব্লেন্ডিং বলা হয় পাটের বেলায় সেই প্রক্রিয়ার নাম ব্যাচিং।

কার্ডিং এন্ড কম্বিক : ব্লেন্ডিং বা ব্যাচিং এবং মিকসিংকৃত তন্তুকে প্রক্রিয়াজাত করণের দ্বিতীয় ধাপ হলো আঁচড়ানো। বস্ত্র শিল্পে এই আঁচড়ানোকে বলা হয় কার্ডিং এন্ড কম্বিং। তুলা, লিনেন, পশম ইত্যাদি তন্তুকে কার্ডিং এবং কম্বিং করা হয়। তন্তুর প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্য ভেদে কার্ডিং এবং কম্বিং প্রক্রিয়ার মধ্যেও পার্থক্য হয়। কার্ডিং-এর মাধ্যমে তন্তু থেকে ধুলাবালি, অন্যান্য ময়লা, অতিরিক্ত ছোট আঁশ দুরীভূত করা হয়। কোনো কোনো তন্তু শুধু

কাডিং করলেই চলে। মিহি, মসৃণ ও সরু সুতার জন্য কম্বিং-এর প্রয়োজন হয়। লিনেন তন্তুর জন্য বিশেষ ধরনের কম্বিং করা হয়। একে বলে হেলকিং। এতে সুতা অত্যন্ত মিহি বা চিকন হয়।

স্পিনিং : এভাবে কাডিং এবং কম্বিং করার ফলে তন্তুগুলো পাতলা আস্তরে পরিণত হয়। এই আস্তরকে বলে স্লিভার। এই স্লিভার থেকেই সুতা কাটা হয়। বস্ত্র শিল্পে সুতা কাটার সর্বশেষ ধাপ হলো স্লিভার থেকে তন্তু পাকিয়ে সুতা তৈরি করা। একেই বলে স্পিনিং। এ পর্যায়ে স্লিভারকে টেনে ক্রমশ সরু করা হয়। একসময় স্লিভারের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক গাছা আঁশ বিদ্যমান থাকে। এভাবে পরবর্তীতে স্লিভারকে মোচড় বা পাক দেয়া হয়। স্লিভারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়াকে বলে রোডিং এবং মোচড় বা পাক দেয়ার প্রক্রিয়াকে বলে টুইস্টিং।

স্লিভারকে মোচড় দেয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায় এবং সুতায় পরিণত হয়। স্বভাবতই মোচড়ের পরিমাণ যত বেশি হবে সুতা তত শক্ত হবে। আবার অতিরিক্ত মোচড়ে সুতা ছিঁড়েও যেতে পারে। মূল তন্তুর দৈর্ঘ্য এবং তন্তুর গুণাগুণ ভেদে সুতা কাটার সময় মোচড়ের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। লম্বা তন্তু বিশিষ্ট পাট বা লিনেনে তুলনামূলকভাবে কম মোচড় দিতে হয়। আবার ছোট মাপের তন্তু কটন, উলেন ইত্যাদিতে তুলনামূলক ভাবে বেশি মোচড় দিতে হয়। সুতা কাটার সময় টুইস্ট কাউন্টার নামক যন্ত্রের সাহায্যে সুতার মোচড়ের দিক ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

রেশম সুতা

রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় এক ধরনের গুটি বা কোকুন। পরিণত কোকুন সাবান পানি সহযোগে লোহার কড়াইতে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করা কোকুন নরম হয় এবং উপর থেকে একটা খোসা বা পরত উঠে যায়। এতে তন্তুর প্রান্তভাগ পাওয়া যায়। প্রান্ত ভাগ ধরে সাবধানে টানলে লম্বা সুতা বেরিয়ে আসে। মিহি তন্তুর জন্য ৫ থেকে ৭টি কোকুনের মাথা বা নাল এবং মোটা বা মাঝারি সুতার জন্য ১৫ থেকে ২০টি কোকুনের নাল একত্রে করে চরকার সাহায্যে ফেটি করা হয়। নালগুলো একত্র করলে পরস্পর আঠালোভাবে লেগে একগাছি সুতায় পরিণত হয় যা প্রয়োজনে স্পিনিং মেশিনের সাহায্যে পাকনি পাকানো যায়।

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা কাটা

যাবতীয় কৃত্রিম তন্তু মোটামুটি একই নিয়মে প্রস্তুত করা হয়। সুতাও তৈরি হয় একই নিয়মে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পলিমারকরণের ফলে একটি দ্রবণ পাওয়া যায়। দ্রবণটি আঠালো। এই দ্রবণ থেকেই সুতার মত লম্বা নালি প্রস্তুত করা হয়। এই দ্রবণকে স্পিনিং দ্রবণ বলে। এই স্পিনিং দ্রবণকে বিশেষ উপায়ে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে প্রবল চাপে ফোয়ারার মত প্রবাহিত করা হয়। এই ফোয়ারাকে জমাট বাঁধানোর জন্য সংগে সংগে প্রবাহ পথে রাসায়নিক দ্রব্য এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত রাখা হয়। এতে ব্যবহারোপযোগী সুতার দীর্ঘনালী অনায়াসে বের হয়ে আসে। চাহিদানুযায়ী প্রয়োজন মত নালী পাক দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের সরু বা মোটা সূতাও তৈরি করা যায়। এ গুলো সরাসরি বস্ত্র বয়নের কাজে ব্যবহার করা যায়। যে যন্ত্রের মাধ্যমে নালীগুলি বের করা হয় এগুলোকে স্পিনারেট বলে।

সুতার কাউন্ট

বয়ন শিল্পে মোটা, মাঝারি, সরু বিভিন্ন ধরনের সুতা ব্যবহার করা হয়। যে সুতার ব্যাস যত বেশি সে সুতা তত মোটা। মোটা সুতার তৈরি কাপড় মোটা এবং ভারী হয়। অন্যদিকে কম ব্যাসের সরু সুতার কাপড় হয় মিহি, মোলায়েম এবং হালকা। সুতা মোটা না সরু তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সুতার কাউন্ট। কাপড় কিনতে গেলে আমরা শুনি ৮০ সুতার কাপড় বা ১০০ সুতার কাপড়। ৮০ থেকে ১০০ সুতার কাপড় চিকন ও হালকা হয়। সুতার এ নম্বরের হিসাব করা হয় সুতার ব্যাসের বিভিন্নতার হিসাবে। একে বলে সুতার কাউন্ট। সুতার কাউন্ট নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতি তিনটি হলো-

- পরোক্ষ বা ওজন পদ্ধতি;

- প্রত্যক্ষ বা দৈর্ঘ্য পদ্ধতি এবং
- সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি।

ওজন পদ্ধতি ও দৈর্ঘ্য পদ্ধতি অতি পুরাতন। ওজন করে কত নম্বর সুতার ওজন কতখানি হবে তা জানা যায়। দৈর্ঘ্য পদ্ধতিতেও সুতার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়। দৈর্ঘ্য ও ওজন পদ্ধতির মাধ্যমেও সুতার পরিমাণ, সুতার ব্যাস সম্বন্ধেও মোটামুটিভাবে জানা যায়। এ দুটো পদ্ধতি এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

আর্ন্তজাতিক পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সুতা যত মোটা হয় নম্বর বা কাউন্ট তত বেশি। পরোক্ষ পদ্ধতিতে সুতা যত মোটা হয়। তার নম্বর তত কম হয়। এতে কাউন্টের বর্ণনায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আবার দুই পদ্ধতিতে দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন সুতার দৈর্ঘ্য এবং ওজনের এককের বিভিন্নতার জন্য পরিমাপ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন তন্তুর জন্য দেশ ভেদেও হিসাবের ধরন ভিন্ন। ফলে আমদানী রফতানির ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও ব্যবহারিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা দুর করার জন্য আন্তর্জাতিক কাউন্ট পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। মূলত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পদ্ধতির জটিলতা এড়ানোর জন্য এবং সমন্বয় সাধনের জন্য International Organization of Standardization (ISO) এই কাউন্ট পদ্ধতি ঘোষণা করে। এই পদ্ধতির নাম টেক্স। এই পদ্ধতিতে পরিমাপের মেট্রিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ওজন দ্বারা কাউন্ট নির্ণয় করা হয়। এজন্য গ্রামকে ওজনের একক এবং কিলোমিটারকে দৈর্ঘ্যের একক ধরা হয়। অর্থাৎ এক হাজার মিটার বা ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুতার ওজন ১ গ্রাম হলে ঐ সুতার কাউন্ট হলো ১ টেক্স। আবার ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুতার ওজন ২ গ্রাম হলে কাউন্ট হবে ২ টেক্স বা ঐ সুতার নং হলো ২।

গাণিতিক উদাহরণ : ৫০০ মিটার সুতার ওজন ৫ গ্রাম হলে, সুতার কাউন্ট নির্ণয় করুন।
সমাধান : ৫০০ মিটার সুতার ওজন = ৫ গ্রাম

$\therefore$ ১ মিটার সুতার ওজন $= \frac{৫}{৫০০}$ গ্রাম

$\therefore$ ১০০০ মিটার সুতার ওজন $= \frac{৫ \times ১০০০}{৫০০} = ১০$ গ্রাম

১০০০ মিটার = ১ কিলোমিটার

$\therefore$ সুতার কাউন্ট হলো = ১০ টেক্স।

অর্থাৎ সুতার নং = ১০

টেক্স সকল প্রকার সুতার জন্য সকল বয়ন শিল্পে বা ব্যবসা বাণিজ্যে একই অর্থ জ্ঞাপক।

সারসংক্ষেপ

- বস্ত্র বয়নের জন্য সুতার প্রয়োজন। এই সুতার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তন্তু সংগ্রহ করা হয়।
- তন্তু সংগ্রহের পর সুতা কাটা হয় ব্লেন্ডিং এন্ড মিকসিং ও কাডিং এবং কম্বিং করার পর স্পিনিং-এর মাধ্যমে। স্পিনিং মানে পাক দেয়া।
- কৃত্রিম তন্তু হতে সুতা তৈরির পদ্ধতি প্রাকৃতিক তন্তু হতে সম্পূর্ণ আলাদা।
- চিকন মোটা সুতার উপর ভিত্তি করে ব্যবহৃত হয়, সুতার কাউন্ট। এটার উপর নির্ভর করে কাপড় মোটা না চিকন হয়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ১ কিলোমিটার সুতার ওজন ১ গ্রাম হলে তার কাউন্ট বা নং হবে ১ টেক্স।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. তন্তু থেকে সুতা তৈরির প্রথম ধাপ কোনটি?
ক. তন্তু বাছাই   খ. তন্তু সংগ্রহ
গ. গাঁইট বাঁধা   ঘ. বেলগুলি স্পিনিং কারখানায় নেয়া।

২. বীজ থেকে তুলা পৃথকীকরণকে কি বলে?
ক. ব্লেন্ডিং   খ. জিনিং
গ. স্পিনিং   ঘ. ফ্রিজিং

৩. স্পিনিং বলতে কি বোয়ায়?
ক. গাঁইট বা বেল তৈরি   খ. সুতা কাটা
গ. আঁশ ছাড়ানো   ঘ. পানিতে ভেজান

৪. সকল প্রকার সুতার জন্য একই অর্থ প্রকাশ করে নিচের কোনটি?
ক. কাউন্ট   খ. টেক্স
গ. মেট্রিক পদ্ধতি   ঘ. ব্রিটিশ পদ্ধতি

৫. ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুতার ওজন ২ গ্রাম হলে ঐ সুতার কাউন্ট কত হবে?
ক. ১০০ টেক্স   খ. ১০০০ টেক্স
গ. ১০ টেক্স   ঘ. ২ টেক্স।

পাঠ ৬.৩

ডাইয়িং বা রং করা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রং এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- রং এর শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন;
- প্রকৃতিজাত রং এবং কৃত্রিম রং-এর পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন;
- কোন বস্ত্রে কি রং লাগানো হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

রং

পরিধেয় পোশাক বা বস্ত্রকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করতে হলে যেমন দরকার বস্ত্রের অন্তর্নিহিত গুণাবলি তেমনি দরকার রং। সুনির্বাচিত রং বস্ত্রের ও পোশাকের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। অনেক সময় বস্ত্র বা তন্তুর নিজস্ব রং থাকলেও পৃথকভাবে রং প্রয়োগ করে তন্তু বা বস্ত্রকে নতুনভাবে প্রতিভাত করা যেতে পারে। রং-এর মত ছাপার মাধ্যমেও বস্ত্রকে সুসজ্জিত করা যেতে পারে। তবে ছাপা এবং রং প্রয়োগের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বস্ত্র বা তন্তুর সম্পূর্ণ অংশে রং লাগানো হয়। ছাপা হয় কেবল বস্ত্রের এক পিঠে বা নির্বাচিত অংশে। বিভিন্ন রং-এর সাহায্যে তন্তু, সুতা বা বস্ত্র রং করাকে ডাইয়িং (Dyeing) বলে।

রং-এর শ্রেণীবিভাগ

বস্ত্রশিল্পের প্রথম যুগে অতি অল্প সংখ্যক রং প্রচলিত ছিল। বর্তমানে আমরা অসংখ্য রং এর সমাবেশ দেখতে পাই। রংকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এক ধরনের রং পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। অন্য প্রকার রং দ্রবীভূত হয় না। দ্রবীভূত রংকে প্রকৃত রং বা ডাই (Dey) বলে। অদ্রবীভূত রংকে পিগমেন্ট (Pigment) বলে। এসব রং-এর কিছু প্রকৃতিজাত এবং কিছু কৃত্রিম।

প্রকৃতিজাত রং (Natural Dye)

প্রথম যুগে মানুষ প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি থেকে রং আহরণ করত; এখন অবশ্য আবার ফ্যাশান জগতে এভাবে আহরিত রং এর প্রতি আকর্ষণ দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। গাছের বাকল, ফুল, ফল, মূল, লতা-পাতা ইত্যাদি থেকে যে রং আহরিত হয় এদের নাম উদ্ভিজ রং (Vegitable dye)। আমাদের দেশে পলাশ, শিমুল, কুসুম, শিউলি ইত্যাদি ফুল থেকে রং তৈরি করা হয়। আবার জাফরান, হলুদ, চন্দন, তেজপাতা, হরিতকি, মেহেদী, জবাপাতা ইত্যাদি থেকে রং আহরণ করা যায়। বৃটিশ শাসনামলে আমাদের দেশে নীল গাছের চাষ হতো। সেখান হতে প্রাপ্ত নীল, নীল রং করার কাজে ব্যবহৃত হতো।

উদ্ভিজ উৎসের মত প্রাণিজ উৎস থেকে রং আহরণের পদ্ধতিও প্রাচীন কাল হতে চলে আসছে। যেমন, রেশম ও পশমের জন্য কোচিনিট্রেপ, লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। এদের নাম প্রাণিজ রং (Animal dye)। উদ্ভিজ ও প্রাণিজ উৎস ছাড়াও ধাতব পদার্থ থেকে যে রং পাওয়া যায় এদের নাম ধাতব রং। যেমন প্রুসিয়ান ব্লু, ক্রোম, হলুদ, সিঁদুর ইত্যাদি। এগুলোও প্রকৃতিজাত রং-এর অন্তর্ভুক্ত।

কৃত্রিম রং (Synthetic dye)

গবেষণাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ১৮৫৬ সালে উইলিয়াম হেনরী পারকিন সর্বপ্রথম রং তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন রংকে বলা হয় কৃত্রিম রং বা ওহর্ভদর্ণধড ঢহণ। বর্তমানে

অসংখ্য প্রকারের কৃত্রিম রং উৎপাদন হয়। দেশে দেশে বস্ত্র শিল্পের পাশাপাশি শত রকমের রং-এর কারখানাও গড়ে উঠেছে। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম রংগুলো ক্রমেই অধিকতর বৈচিত্রময় ও স্থায়ী করে তোলা হচ্ছে। কৃত্রিম রং আট প্রকার-

- অম্ল জাতীয় রং (Acid dye);
- ক্ষার জাতীয় রং (Basic dye);
- মরড্যান্ট বা আস্তর জাতীয় রং (Mordant dye);
- প্রত্যক্ষ রং (Direct dye);
- বিকশিত রং (Developed dye);
- ন্যাপথল বা এজয়িক রং (Napthol or Azoic dye);
- ভ্যাট রং (Vat dye);
- পিগমেন্ট রং Pigment dye);

অম্ল রং : এসিড থেকে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন ধরনের ধাতব লবণ যেমন, সোডিয়াম সালফেট। এর ব্যবহারিক নাম গ্লোবার সল্ট। এই রং সহজে পানিতে দ্রবীভূত হয়। এই রং প্রাণিজ তন্তু রেশম এবং সিনথেটিক তন্তু ওরলিন, এক্সাইলিন, নাইলন ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যায়। দামে কম হলেও সুতি কাপড়ে এ রং মোটেই পাকা হয় না। পানিতে ধুলেই এ রং উঠে যায়। তবে রেশম ও পশমের ক্ষেত্রে এ রং বেশ পাকা। এ রংগুলোকে বাণিজ্যিক রং বলে।

ক্ষারীয় রং : ক্ষার জাতীয় জৈব পদার্থ থেকে তৈরি রংকে ক্ষারীয় রং বলে। এসব রং আবিষ্কার হয়েছিল এনিলিন নামের জৈব যৌগ থেকে। এজন্য এদেরকে এনিলিন রংও বলা হয়। এ রং সুতি, লিনেন, রেয়ন ও পশমের উপর প্রয়োগ করা যায়। তবে সাধারণত রেশম ও পশমে এ রং উজ্জ্বল ও পাকা হয়। প্রাণিজ তন্তু ছাড়া সুতি, লিনেন, এসিটেট বা নাইলন তন্তুতে এ রং প্রয়োগের জন্য একটি আস্তর জাতীয় রং ব্যবহার করা হয়। এই জাতীয় রং বাজারে পাউডার বা দানা রং হিসাবে পরিচিত।

আস্তর জাতীয় রং : অনেক রং তন্তু বা বস্ত্রে ধরে না। রং করার পর সুতা বা কাপড় পানিতে ধুলেই রং উঠে যায়। এ ক্ষেত্রে কাপড়ে যাতে রং ধরে সে জন্য প্রয়োজনীয় রং দেয়ার আগে সুতা বা কাপড়ে একটি প্রলেপ ধরাতে হয়। প্রলেপ যদি সুতার গায়ে লেগে থাকে তখন রং করলে সুতার গায়ে রং বসে। এই প্রলেপকে বলে মরড্যান্ট বা অস্তর। মরড্যান্টের সাহায্যে যে সব রং বস্ত্রে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে মরড্যান্ট বা আস্তর জাতীয় রং বলে। যেমন- ফিট্‌কিরি একটি মরড্যান্ট। রং করার আগে কাপড়কে ফিটকিরি দ্রবণে ভিজিয়ে নিতে হয়। এতে রং পাকা হয়। এছাড়া ক্রোমিয়াম, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের ধাতব লবণ মরড্যান্ট হিসাবে কাজ করে।

প্রত্যক্ষ রং : যে সব রং প্রয়োগের জন্য মরড্যান্ট ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না তাদের প্রত্যক্ষ রং বলে। এই রং পশমের জন্য বেশি পাকা এবং রেশমের জন্য মোটামুটি পাকা হয়। তবে সুতি বস্ত্রে এই রং-এর প্রয়োগ বেশি। ধোয়ার ফলে যাতে রং উঠে না যায় সে জন্য প্রত্যক্ষ রং দেয়া বস্ত্রটিকে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট এর পানিতে বিশ মিনিটকাল গরম করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। অনেক সময় তুঁতে প্রয়োগ করেও ফল পাওয়া যায়।

বিকশিত রং : কতগুলো প্রত্যক্ষ রংকে বিশেষ পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে যথেষ্ট পাকা রং উৎপন্ন করা হয়। এই পদ্ধতিকে ডায়োজোটাইজিং বা ডেভলপিং বলা হয়। এই জাতীয় রং প্রয়োগ করার সময় বস্ত্রটিকে রং-এর গামলায় ডুবিয়ে নিয়ে পরে সোডিয়াম নাইট্রেটের একটি ঠান্ডা দ্রবণে ডুবাতে হয়। এতে মূল রংটি একটি সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই জাতীয় রং সূতি, লিনেন, রেয়ন, অ্যাসিটেট, আরলেন, ডেক্রন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাজোইক রং : এই রং সাধারণত সুতি বস্ত্রে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাপড় প্রথমে ন্যাপথলে এবং পরে ডায়োজোটাইজ রং এ ডুবান হয়। রং লাগাবার পর কাপড়টি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। এই রং করার সময় রংগুলো বারবার বরফ দিয়ে ঠান্ডা করা হয় তাই এই রংকে বরফ রংও বলে। এই জাতীয় রং সোডা সাবান এমনকি বি- চিংয়েও পাকা, কিন্তু আলোতে আসতে আসতে ফিকে হয়ে যায়।

ভ্যাট রং : সুতি, লিনেন এবং রেয়নের জন্য এই রং সবচেয়ে পাকা হয়। নাইলন, ডেক্রন, ওরলন, এক্সাইলিক, স্পানডেক্স ইত্যাদি সিনথেটিক তন্তুতেও ব্যবহার করা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মরড্যান্ট ব্যবহার করতে হয়। রেশম ও পশমের জন্য ভ্যাট রং প্রযোজ্য নয়। ভ্যাট রং তিন ধরনের। নীল ভ্যাট, অ্যানথ্রাকুইনিনো ভ্যাট এবং সালফার ভ্যাট।

পিগমেন্ট রং : ছাপার কাজে এই রং ব্যবহৃত হয়।

বস্ত্রে রং প্রয়োগ

বস্ত্র বয়ন শিল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে রং লাগান হয়। কোনো ক্ষেত্রে তন্তুতে, কোনো ক্ষেত্রে সুতায়, কোনো ক্ষেত্রে কাপড়ের পুরো থানটিতে, আবার কখনো বা পোশাক তৈরির পর। রং লাগানোর এই পদ্ধতিগুলো হল :-

- স্টক ডাইং (Stock dyeing)-তন্তু কাঁচামাল অবস্থায় রং প্রয়োগ।
- ইয়ার্ন ডাইং (Yarn dyeing)-সুতায় রং প্রয়োগ।
- পিস ডাইং (Piece dyeing)-খন্ড খন্ড বস্ত্রে বা পোশাকে রং প্রয়োগ।
- ক্রস ডাইং- প্রথম দুটির সমন্বিত রূপ।
- জিগ ডাইং- খন্ড কাপড়ে বা কাপড়ের রোলে রং প্রসঙ্গে।
- দ্রবণ পিগমেন্ট (Solution pigmenting)-কৃত্রিম সিনথেটিক তন্তুগুলো স্পিনারেটের ছিদ্র দিয়ে বের হওয়ার পূর্বে এমন রং করা হয়।

স্টক ডাইং : স্টক ডাইং হল মজবুত বা কাঁচামাল অবস্থায় রং করা। এই পদ্ধতিতে তন্তুগুলো একটি রং-এর পাত্র বা গামলায় ডুবিয়ে রং করা হয়। এর দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। দ্রবণ পদ্ধতি ও শীর্ষ পদ্ধতি। দ্রবণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন রং-এর দ্রবণে সুতা কাটার আগেই তন্তুগুলি ভিজিয়ে নেয়া হয়। এই পদ্ধতি কম ব্যয়বহুল। এভাবে করা রং সহজে ফিকে হয় না। রং করার ফলে তন্তুগলো বেশ শক্ত হয় বলে সুতা কাটা অধিকতর জটিল হয়। শীর্ষ পদ্ধতিতে রং করার প্রক্রিয়া একটু আলাদা। কম্বিং যন্ত্র থেকে পশমের লম্বা আলগা দড়ির মত শীর্ষে রঙ লাগান হয়। ছিদ্রযুক্ত টেকোতে বল আকারে দড়িগুলো গুটিয়ে একটা চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হয়। এই চৌবাচ্চার ভিতর দিয়ে পাম্পের সাহায্যে রং ঢুকিয়ে বের করা হয়। আবার কম্বিং-এর পর স্লিভার করার সময় তন্তুর বিভিন্ন স্থানে রং লাগান হয়। এতে সুতা কাটার পর সুতার বিভিন্ন স্থানে সুন্দর রং ফুটে ওঠে। একে স্লাব ডাইং বলে।

ইয়ার্ণ ডাইং : বস্ত্র বয়নের আগেই সুতাকে রং করার প্রক্রিয়াকে ইয়ার্ণ ডাইং বলে। তন্তু থেকে প্রস্তুত সুতা লাটাই (Spool) অথবা ফেটিতে (Skein) জড়ান থাকে। এই অবস্থায় সুতাকে রং-এর দ্রবণে ডুবিয়ে রং করা হয়। এভাবে সুতায় রং লাগালে রঙ তন্তুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে বলে রঙ খুব পাকা হয়।

পিস ডাইং : সম্পূর্ণ বস্ত্র তৈরি হওয়ার পর তাতে রং লাগানোর প্রক্রিয়াকে বলে পিস ডাইং। অনেক সময় একে ডিপ ডাইংও বলে। এতে ঘনিষ্ঠভাবে রং সুতায় লাগে না ফলে খরচ কম হয়। তন্তু বা সুতার সব অংশে সুষমভাবে লাগেনা বলে রঙ পাকা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। লিনেন, রেশম, ক্রেপ এবং খুব পাতলা সুতির কাপড় যেমন অরগ্যান্ডি, ভয়েল ইত্যাদিতে এই পদ্ধতিতে রং লাগান হয়।

জিগ ডাইং : এই পদ্ধতিতে একটি রং-এর পাত্র বা গামলার মধ্যে স্থাপিত দুটি রোলারের মধ্য দিয়ে বস্ত্রকে চালান হয়। এতে বস্ত্রে রং লাগে। রেয়ন বা নাইলনকে এ পদ্ধতিতে রং করা হয়। বিশাল বিশাল কাপড়ের রোলকে কারখানায় এই পদ্ধতিতে অতি দ্রুত রং করা হয়।

প্রিন্টিং : প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় অনেক কাপড় রং করা হয়। আসলে প্রিন্টিংকে ডাই বা রং-এর শ্রেণীতে ফেলা ঠিক হয় না। বস্ত্রে ছাপ দিয়ে রং লাগানোর প্রক্রিয়াকে প্রিন্টিং বলে। এতে বিভিন্ন রং দিয়ে কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন ডিজাইন খোদাই বা আঁকা হয়। ডিজাইন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রোলারে ভিন্ন ভিন্ন নক্সা খোদাই করা থাকে। রোলারে প্রয়োজনীয় রং লাগিয়ে কাপড়ে ছাপ দেয়া হয়। আবার ছোট ছোট ডাইসের সাহায্যেও কাপড়ের একপিঠ রং হয় অন্যপিঠ সাদা বা ছাপবিহীন থাকে।

রং বস্ত্রকে সুন্দর ও মনোরম করে। কিন্তু অধিকাংশ রং-এর উৎস রাসায়নিক দ্রব্য। কারখানায় বস্ত্র রং করার পর এসব রং-এর বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত না করলে পরিবেশ দুষণ ঘটায়। বিশেষ করে জলাশয় বা নদী এবং সমুদ্রে বর্জ্য ফেললে পানি দুষিত হয় এবং জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের ক্ষতি হয়। বিষক্রিয়ায় মাছ ও অন্যান্য

জলজ প্রাণি মারা যায়। পরিবেশ দুষণ মুক্ত রাখতে হলে কারখানায় বর্জ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত ও সঠিকভাবে সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া উচিৎ।

সারসংক্ষেপ

- পরিধেয় বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার জন্য রং ব্যবহার করা হয়। রং সাধারণত দুই ধরনের : প্রকৃতিজাত ও কৃত্রিম রং।
- প্রকৃতিজাত রং সাধারণত প্রাণিজ, উদ্ভিজ এবং খনিজ। বহু ধরনের কৃত্রিম রং আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক রং-এর ব্যবহারও কমে গেছে।
- বস্ত্রে রং প্রয়োগকে ডাইং বলে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাপড় রং করা হয়। বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় কাপড় রং করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গবেষণাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বপ্রথম রং তৈরি করেন কে?
ক. উইলিয়াম হুক খ. রবার্ট হেনরী গ. উইলিয়াম হেনরী পারকিন ঘ. ডালটন

২. সোডিয়াম সালফেট-এর ব্যবহারিক নাম কি?
ক. ডায়্যাজনিয়াম লবণ খ. গ্লোবার সল্ট গ. ফিটকিরি ঘ. ব্লিচিং পাউডার

৩. কোনটিতে অম্ল রং প্রয়োগ করা হয়?
ক. লিনেন খ. ওরলিন গ. রেয়ন ঘ. সুতি কাপড়

৪. সুতা রং করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
ক. স্টক ডাইং খ. ইয়ার্ন ডাইং গ. পিগমেন্টিং ঘ. জিগ ডাইং

৫. বস্ত্রে ছাপ দিয়ে রং লাগানোকে কি বলে?
ক. স্পিনিং খ. ডাইং গ. প্রিন্টিং ঘ. কম্বিং

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রেশম সুতার উৎস কি? কিভাবে রেশম সুতা তৈরি করা হয়।
২. তন্তু কত প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার তন্তুর বর্ণনা দিন।
৩. কৃত্রিম তন্তু সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৪. রং কি, কত প্রকার? বিভিন্ন প্রকার রং এর নাম লিখুন।
৫. সুতার কাউন্ট কি? কাউন্টের আন্তর্জাতিক পদ্ধতির বর্ণনা দিন।
৬. বয়নশিল্পে কাডিং এন্ড কম্বিং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৭. আস্তর বা মরড্যান্ট কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৮. প্রকৃতিজাত রং বলতে কি বোঝেন? কয়েকটির উদাহরণ দিন।
৯. বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম রং-এর নাম লিখুন।
১০. বস্ত্রে রং করার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করুন।
১১. কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা কাটার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১২. টিকা লিখুন : জিগ ডাইং, অ্যাসবেসটস, বিকশিত রং, প্রিন্টিং।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ : ১. খ ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ : ১. ক ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ : ১. গ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. গ